International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 180-182
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 25-03-2026
Accepted: 06-04-2026
Publish : 07-04-2026

Manasi Biswas
M.A , Department of History,
University of Kalyani, Nadia,
West Bengal,

Correspondence:
Manasi Biswas
M.A , Department of History,
University of Kalyani, Nadia,
West Bengal,

বঙ্গীয় বিপ্লবী সংগ্রামী বাঙালি নারীদের ভূমিকা (1905-1935) : একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

Manusi Biswas

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19490992

ভূমিকা-উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক মানচিত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তা এক অনন্য অগ্নিঝরা অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ (1905) এর পর থেকে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ইতিহাসের এক অগ্নিগর্ভ পর্যায়ের উত্থান ঘটায়। 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে 1935 সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তন পর্যন্ত এই তিন দশকে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, সেখানে বাঙালি নারীদের অংশগ্রহণ ছিল এক যুগান্তরকারী ও সমাজতান্ত্রিক বিস্ময়। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের বয়ানকে ছাপিয়ে কীভাবে বাঙালি নারীরা অন্তরমহলের গন্ডি পেরিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্রভাগে উঠে এসেছিলেন তার একটি সামগ্রিক ও বিশ্লেষণাত্মক রূপরেখা তৈরি করা। বাংলার এই বিশেষ ঐতিহাসিক কালখন্ডে নারীদের ভূমিকা কেবল সহায়ক বা আলঙ্কারিক ছিল না, বরং তারা ছিলেন রণকৌশল নির্ধারণকারী,অস্ত্র সরবরাহকারী,সম্মুখ সমরের নির্ভীক যোদ্ধা। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদের 1905 সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের দিকে তাকাতে হবে। এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটি বাংলার জনমানসে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, তা কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা এক সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগার রূপ ধারণ করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং রাজনৈতিক দমন- পীড়ন জনসাধারণের মধ্যে যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, তা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথকে প্রশস্ত করে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় বাঙালি নারীরা তাদের সনাতনী ঘরোয়ার ভূমিকা ত্যাগ করে এক আমূল পরিবর্তনকারী রূপে আবির্ভূত হন । এই আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তি ছিল, অত্যন্ত গভীর এবং তা মূলত হিন্দু ধর্মের ' শক্তি ' উপাসনা এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ' আনন্দমঠ ' উপন্যাসের ' বন্দেমাতরম ' মন্ত্র নারীদের মধ্যে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। দেবী দুর্গা বা কালীর আদলে দেবীদেরকে শক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করে দেশমাতৃকাকে ' ভারতমাতা ' হিসেবে পূজা করার প্রথা এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার যে ডাক দেওয়াহয়েছিল তা বাঙালি নারীদের হৃদয়ের মধ্যে এক বিশেষ অনুরন সৃষ্টি করে । নারীরা নিজেদেরকে এই শক্তির অংশ হিসেবে অনুভব করতে শুরু করেন। তাঁদেরকে চিরাচরিত গৃহবধূ বা মায়ের ভাবমূর্তি থেকে বের করে এনে এক সাহসী যোদ্ধার মূর্তিতে অধিষ্ঠিত করেন , যা কেবল ঔপনিবেশিক শক্তিকেই চ্যালেঞ্জ করেনি , বরং ভারতীয় সমাজের সুগভীর পিতৃতন্ত্রকেওষ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। এই গবেষণা পত্রটি 1905-1935 সাল পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি নারীদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, তাদের সাংগাঠনিক দক্ষতা, তাত্ত্বিক অবদান এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম এবং বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের অংশ হিসেবে একটি নিবিড় বিশ্লেষণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুখ্য বিষয়- গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকবে বাংলার বিপ্লবী ভাবাদর্শের বিবর্তন ।এই গবেষণার প্রস্তাবিত কাঠামোটিতে 1905-1935 সাল পর্যন্ত সময়কালকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় । যা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বিবর্তনকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে । প্রতিটি পর্যায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল এবং এর সাথে সাথে নারীদের ভূমিকা ও প্রকৃতিরও বিবর্তন হয়েছিল । প্রথম পর্যায়ে 1905-1919 (স্বদেশী ও প্রাথমিক প্রতিরোধ) নারীদের ভূমিকা ছিল মূলত প্রতীকী এবং সহায়ক । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারীরা বিদেশী পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের শপথ নিয়েছিল। সরলা দেবী চৌধুরানীর মতো নেত্রীরা এসময়ে শারীরিক শিক্ষা ও শরীরচর্চার ওপর জোর দিয়ে

নারীদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। 1907 সালের কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত ' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা নারীদের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক ছিল। ননীবালা দেবীর মতো নারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীদের আশ্রয় প্রদান ও সংবাদ আদান- প্রদানের কাজে লিপ্ত হন, যা তৎকালীন সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রেক্ষাপটে ছিল চরম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পর্যায় 1920-1929 (প্রতিষ্ঠানিক সাংগাঠনিক বিস্তার ও নারী সংগঠনের জন্ম) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধীজীর রাজনৈতিক উত্থান বাংলার নারী সমাজকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করেন । তবে বাংলার বিপ্লবী নারীরা কেবল অহিংস আন্দোলনে সন্তুষ্ট ছিলেন না । 1923 সালের লীলা নাগের নেতৃত্বে ' দীপালী সংঘ ' প্রতিষ্ঠা বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এটি ছিল প্রথম নারী সংগঠন যা সরাসরি বৈপ্লবিক আদর্শ এবং আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন।1928 সালে কলকাতার ' ছাত্রী সংঘ ' গঠন ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই পর্যায়ে নারীরা গোয়েন্দা, নজরদারি এড়ানো, অস্ত্রপাচার এবং প্রচার পত্র বিলি করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংগাঠনিক দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। তৃতীয় পর্যায় 1930-1935 (প্রত্যক্ষ সশস্ত্র আক্রমণ ও চরম আত্মত্যাগ) এটি ছিল বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও গৌরবোজ্জ্বল পর্যায়। 1930 সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, নারীরা সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশ নিতে সক্ষম। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তের মতো বিপ্লবীরা এই পর্যায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন । 1932 সালের পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ এবং 1931 সালের কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়ার মতন ঘটনা । এই পর্যায়ের সহিংসতা কেবল রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছিলনা, বরং তা ছিল নারী শক্তির এক চরম বহিঃপ্রকাশ।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তার শৈশবকাল পার করছিল । তখন সরলা দেবী চৌধুরী রানী এক অনন্য পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হন ।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি হওয়ার সত্ত্বেও তিনি কেবল সাহিত্যের আঙিনায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি । তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক, সমাজ সেবিকা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী । 1902 সালে তিনি কলকাতায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। যেখানে যুবকদের লাঠি খেলা ও তলোয়ার চালানো শেখানো হত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাঙালিদের ওপর থেকে ভীরু অপবাদ মোচনের জন্য শারীরিক শক্তি অর্জন অপরিহার্য। বিপ্লবী মতাদর্শে বিশ্বাসী সরলা দেবী স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন । তিনি ' বীরাষ্টমী ' ব্রত এবং 'প্রতাপাদিত্য ' উৎসব শুরু করেন যা ছিল মূলত বীরত্বের আরাধনা। সরলা দেবীর এই প্রচেষ্টা কেবল পুরুষদের জন্যই ছিল না , তিনি নারীদের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করেছিলেন । 1904 সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি মেয়েদের দিয়ে ' বন্দেমাতরম ' গান গাইয়েছিলেন এবং 1905 সালের আনন্দমঠের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম সারির নারী সংগঠক। নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য 1910 সালে ' ভারত স্ত্রী মহামন্ডল ' প্রতিষ্ঠা করেন। তার কর্মকাণ্ড অনুশীলন সমিতির মতো গুপ্ত সংগঠন গুলোর ভিত্তি তৈরিতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের শুরুর দিকে ' অনুশীলন সমিতি ' বা 'যুগান্তর ' দলের মতো সংগঠনগুলো নারীদের সরাসরি সদস্যপদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও দ্বিধা গ্রস্ত ছিল। বিপ্লবী নেতাদের একটি বড় অংশ মনে করতেন যে, বিপ্লবীদের ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত এবং নারীদের সান্নিধ্য তাঁদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। এমনকি অরবিন্দ ঘোষ তার সহযোগী যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নারীদের সাথে মেলামেশার অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন । তবে এই মানসিকতা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। যখন দেখা যায় যে, বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা রক্ষা এবং অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নারীর পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি সফল এবং পুলিশের সন্দেহের উর্ধ্বে । এই জন্যেই বিপ্লবী নেতারা ধীরে ধীরে তাদের মা, বোন এবং আত্মীয়াদের সংগঠনের কাজে নিয়োগ করতে শুরু করেন । এখানে নারীর তাঁদের ঘরোয়া অবস্থানকে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক কৌশলে রূপান্তরিত করেছিলেন। 1907 সালের দিকে কলকাতায় স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর পুলিশের আক্রমনের সময় স্থানীয় নারীরা ছাদ থেকে পাথর ছুঁড়ে পুলিশকে প্রতিহত করেছিলেন , যা ছিল সাধারণ নারীদের মধ্যে গড়ে ওঠা বৈপ্লবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

দীপালী সংঘ ও লীলা নাগের অবদান - 1923 সালে ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী ছাত্রী হিসেবে লীলা নাগ (রায়) মহিলাদের কল্যাণের জন্য 12 জন সহকর্মী নিয়ে ঢাকায় ' দীপালী সংঘ ' গঠন করেন । যা ছিল বাংলার প্রথম প্রকৃত নারী বিপ্লবী সংগঠন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল কোন নারীদের শিক্ষিত করা নয়, বরং তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শের বীজ বপন করা। দীপালী সংঘের অধীনে নারীদের আত্মরক্ষার জন্য লাঠি খেলা , তলোয়ার চালানো এবং শারীরিক কসরতের মাধ্যমে নারীদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা হয়। লীলা নাগ মনে করতেন , শিক্ষা ছাড়া রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয় তাই তিনি ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরে ' নারী শিক্ষা মন্দির ' ও 'শিক্ষা ভবন ' নামে দুটি ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতন বিখ্যাত বিপ্লবীরা এই সংঘ থেকেই তাঁদের বৈপ্লবিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। 1931 সালের লীলা নাগ ' জয়শ্রী ' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন । যা ছিল সম্পূর্ণভাবে নারীদের দ্বারা পরিচালিত। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার নারীদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা ও দেশসেবার নির্ভীক ইচ্ছা জাগানো এবং যা বৈপ্লবিক চিন্তার ধারকও ছিল।

ছাত্রী সংঘ ও বেথুন কলেজের ভূমিকা- কলকাতার বেথুন কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছাত্রী সংঘ ছিল উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। বেথুন কলেজ এসময় নারী বিপ্লবীদের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ছাত্রী সংঘের সদস্যরা সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। কল্যাণী দাস, কমলা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি লতি খেলা এবং অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপ্লবীদের জন্য গোপন আস্তানা ও অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করত।1928 সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে যে নারী ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়েছিল, তা ছিল ছাত্রী সংঘের শক্তির এক বহিরঃপ্রকাশ। লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে 300 জন স্বেচ্ছাসেবক সামরিক পোশাকে অংশ নিয়ে পুরো ভারতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

1930 এর দশককে বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের শীর্ষ সময় বলা যেতে পারে । কেননা, এসময় নারীরা কেবলমাত্র অস্ত্রপাচারকারী বা বার্তাবাহক হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি । তাঁরা সরাসরি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ করতে শুরু করে। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নারীরাই শ্রেষ্ঠ সেনানী হতে পারেন। তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্তকে তার ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মি (IRA) -র সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত বৈপ্লবিক, কারণ এর আগে কোনো বিপ্লবী দল নারীদের সরাসরি অ্যাকশন স্কোয়াডে নিয়োগ করেনি । প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ। 1932 সালে 24th সেপ্টেম্বর মাত্র 21 বছর বয়স্কা তরুণী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দলের নেতৃত্বে দিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন । এই ক্লাবটি ব্রিটিশদের জাতি বিদ্বেষের প্রতীক, যার বাইরে লেখা থাকত ' কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ '। প্রীতিলতা পাঞ্জাবী পুরুষের ছদ্মবেশে এই আক্রমণ পরিচালনা করেন। সফলভাবে বোমা ও

গুলিবর্ষণের পর যখন তাঁরা ফিরে আসছিলেন , তখন তিনি গুলিতে আহত হন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে তার আত্মাহুতি প্রমাণ করেছিল যে, মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াও এক প্রকারের জয় । তাঁর এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে , দেশের জন্য জীবন দিতে নারীরাও পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী সময়ে কল্পনা দত্তর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে বিস্ফোরক বহন করা এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিপ্লবীদের রসদ পৌঁছে দেওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। 1933 সালের গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিটিশ পুলিশের জন্য এক মূর্তিমান আতঙ্ক । 1930-1932 এর সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে শিক্ষিতা বাঙালি মেয়েরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজের যে অংশটি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল তা অধিকাংশই ছিল অল্প বয়সী তরুণী এবং ছাত্রী বা সদ্য ছাত্রী জীবন শেষ করা শিক্ষিতা ভদ্র পরিবারের মেয়েরা। সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্যের জন্য প্রত্যক্ষ আক্রমণের চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল সঠিক পরিকল্পনা ও লজিস্টিক সাপোর্ট। বাঙালি নারীরা এখানে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধি ভিত্তিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদেরকে অত্যন্ত সুকৌশলের সাথে বিপ্লবের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা হলো কুমিল্লার দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর সাহসিকতা। 1931 সালের 24 শে ডিসেম্বর মাত্র 14-15 বছর বয়সী এই দুই কিশোরী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্টিভেন্সকে তাঁর বাসভবনে গিয়ে গুলি করে হত্যা করেন ।তাদের চেহারায় কোনো ভীতি ছিল না। এই হত্যাকাণ্ড পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা ভাবতেও পারিনি যে সাধারণ ফ্রক পড়া স্কুল ছাত্রীরা পকেটে রিভলবার নিয়ে ঘুরতে পারে। তাঁদের এই কাজ তরুন প্রজন্মের কাছে এক বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে, 1932 সালের 6 th ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হলে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বীণা দাস গুলি চালান, যা ছিল এক অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা। বীণা দাস কোনো সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র । তাঁর এই পদক্ষেপ ছিল চরম সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ । আদালতে তাঁর দীর্ঘ জবানবন্দী বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে তিনি অত্যন্ত সচেতনার সাথে রাজনৈতিক প্রতিরোধের পথকে বেছে নিয়েছিলেন। কমলা দাশগুপ্তের মতো নেত্রীরাও বিপ্লবীদের জন্য বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংরক্ষণ করতেন এবং তা বহন করে আনতেন । 1938 সালের কমলা দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত ' মন্দিরা ' পত্রিকা বিপ্লবীদের সংবাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল। কমলা দাশগুপ্তের নিজস্ব লেখাগুলো থেকে জানা যায় যে, কিভাবে তারা জেলের ভিতর ও বাইরে থেকে সাংগাঠনিক কাজ পরিচালনা করতেন। তিনি ঢাকার একটি দরিদ্র নারী হোস্টেলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন এবং সেই হোস্টেলটি ছিল বিপ্লবীদের অস্ত্র ভান্ডার । তিনি ফলের ঝুড়িতে বোমা ও রিভলবার লুকিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিতেন। গোয়েন্দা নথিপত্রানুসারে, বীণা দাসকে কমলা দাশগুপ্তই রিভলবারটি সরবরাহ করেছিলেন।1935 সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পর ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলাতে থাকে। অনেক সশস্ত্র বিপ্লবী এসময় কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং তাঁদের রাজনৈতিক দর্শনের পরিবর্তন আসে। ব্রিটিশদের সরাসরি আক্রমণের চেয়ে জনসমর্থন ভিত্তিক আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে অনেকের ঝোঁক তৈরি হয়। কল্পনা দত্ত জেল থেকে মুক্তির পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান দেন এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের লড়াইয়ে নামেন । লীলা নাগও সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের সাথে যুক্ত হয়ে রাজনীতি চালিয়ে যান । এই রূপান্তরটি প্রমাণ করে যে, বাঙালি নারী বিপ্লবীদের দেশপ্রেম কোনো ব্রিটিশ তাড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘমেয়াদী লড়াই ।

উপসংহার- 1905 থেকে 1935 সাল পর্যন্ত বাঙালি নারীদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি অংশ নয় , বরং এটি বাংলার সামাজিক কাঠামোর এক আমূল পরিবর্তনের দলিল। যা ছিল বাঙালি নারীর আত্মপরিচয় সন্ধানের এক তীব্র প্রয়াস। নারীরা প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁরা কেবলমাত্র মাতা বা জায়া নন তাঁরা বীর যোদ্ধা। তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সেই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছিলেন যেখানে রাজনীতি কেবলমাত্র পুরুষদের এলাকার হিসেবে গণ্য হতো। বিপ্লবের মাধ্যমে ঘরের অন্তরমহল সরাসরি দেশের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। রান্নাঘর থেকে শুরু করে শোবার ঘর - সবই হয়ে উঠেছিল বিপ্লবের গোপন আস্তানা। এই গবেষণার প্রস্তাবটি সেই বীরাঙ্গনাদের প্রতি শুধুমাত্র একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয় বরং তাদের লড়াইয়ের আদর্শিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা। বাংলার আকাশ যেদিন বিপ্লবের ঝড়ে কেঁপে উঠেছিল, সেই দিন নারীরা কেবল সাক্ষী ছিলেন না, তারা ছিলেন সেই ঝড়েরই অন্যতম কারিগর। বঙ্গীয় নারী বিপ্লবীদের এই দীর্ঘ সংগ্রাম বর্তমান সময়ের বাঙালি সমাজের লিঙ্গীয় ভূমিকা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ওপর সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাব গুলো কেবল স্মৃতিচারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা বর্তমান সমাজের কাঠামোকে রূপান্তরিত করেছে। বিপ্লবী নারীরা প্রথাগত গৃহবধূর ইমেজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঝুঁকির অংশীদারও হতে পারেন। বিপ্লবী নারীদের লড়াই ছিল মূলত দ্বিমুখী - একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে নিজ সমাজের পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে। বর্তমান সমাজেও কর্মক্ষেত্রে সফল হচ্ছে , অন্যদিকে পারিবারিক স্তরে টাইম পভার্টি (Time Poverty) বা গৃহস্থালি কাজের অসম বন্টনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বিপ্লবী নারীদের বীরত্ব গাথা আজও সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। নারীরা এখন কেবল ত্যাগের প্রতিমূর্তি নন বরং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিপ্লবী আন্দোলন আমাদের যে সাহসিকতা শিখিয়েছিল বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নারীরা এখন আর নিজেদেরকে ' দ্বিতীয় লিঙ্গ ' হিসেবে ভাবে না, বরং তারা রাষ্ট্রের এবং সমাজের সমান অংশীদার। যেকোনো স্বৈরাচারী শাসন বা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীদের রাজপথে নেমে আসার যে প্রবণতার তা সেই বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারেরই ফসল। সমাজ এখন নারীদেরকে নেতৃত্বের আসনে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে , যা একসময় অকল্পনীয় ছিল। পরিশেষে বলাবাহুল্য, বঙ্গীয় নারী বিপ্লবীদের সংগ্রাম আমাদের শিখিয়েছে, যে স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক নয় বরং এটি একটি নিরন্তর সামাজিক ও লিঙ্গীয় মুক্তির প্রক্রিয়া। বর্তমান প্রজন্মের নারীরা যখন শিক্ষা, বিজ্ঞান বা রাজনীতিতে নতুন নতুন শিখর জয় করেন। তখন তারা প্রকৃতপক্ষে সেই সব বীরাঙ্গনাদেরই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেন । যারা একসময় পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহুতি দেওয়া বা পর্দাপ্রথার বেষ্টনী ভেঙে পিস্তল উঁচিয়ে দেশের মুক্তির জন্য লড়েছিলেন। এই বিপ্লবীদের উত্তরাধিকার আমাদের সমাজকে এক শোষণহীন, বৈষম্যহীন এবং মানবিক ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করবে।

গ্রন্থপঞ্জী:-

1. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ.
2. সরকার , সুমিত , মডার্ন ইন্ডিয়া (1885-1947)
3. Chandra , Bipan , India's Struggle for Independence
4. https://www.prothomalony.com/news/6765
5. https://bn.wikipedia.org/wiki
6. https://bn.wikipedia.org/wiki/
7. https://www.teachers.gov.bd/blog/details/755430?page=1043&bismrritir-ontrale-kintu-apn-krme-ujjwl-leela-nag-raz&hl=en-IN
8. https://share.google/6sXyQKC9zycn3dUvQ
9. https://share.google/GvYJszEnF7Pjpre3X